মানবাধিকার লংঘন এবং ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের নিহিত বিষয়সমূহ—অধ্যাপক (ডঃ) অমিত সেন, সদস্য

এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য যে বিশ্বের প্রায় সকল উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে মানবাধিকার লংঘনের হার বর্ধিত এবং এই মানবাধিকার লংঘন এখন এক জ্বলন্ত বিষয়। আবার প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে নিজ নিজ পথে এই লংঘনকে রুখতে। প্রথমেই জানা দরকার 'মানবাধিকারের' সংজ্ঞা কী? মানবাধিকারের ধারণা স্বাভাবিক অধিকারের নীতির সমতুল্য প্রাচীন। মানবাধিকারের সংজ্ঞায় তাই বলা যেতে পারে মানবাধিকার হল সেই সকল অধিকার যা ব্যতীত জীবনধারণ সম্ভব নয় এবং যা স্বাভাবিকভাবে অর্জিত হয়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিই রাষ্ট্র দ্বারা প্রাপ্ত এই সকল অধিকার ভোগ করে। সুতরাং মানবাধিকার বলতে সেই সকল অধিকার বোঝায় যা প্রতিটি ব্যক্তি কেবল তার মানবজন্মের সুবাদেই রাষ্ট্র অথবা অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ-এর বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অন্যথায় মানবাধিকার হল প্রতিটি ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সমতা এবং মর্যাদা জনিত অধিকার। মানবাধিকার সুরক্ষা আজ সমগ্র বিশ্বে রাজনৈতিক প্রাধান্য পাচ্ছে।

জীবন এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যেই মানবাধিকারের ধারণা নিহিত। এই সকল সংগ্রামের ফলেই রাষ্ট্রসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা নামক এক দলিল গ্রহণ করে যা নিশ্চিত করে যে সকল মানবই জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে এবং আইনের চোখে সকলেই সমান এবং সমান নিরাপত্তার অধিকারী।

বলা বাহুল্য যে সংবিধানের ৩ নং অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারগুলিকে সংকলিত করার সময় ভারতীয় সংবিধানের রূপকারেরা 'সার্বজনীন ঘোষণা'র বিষয়াবলীর দ্বারা প্রভুতভাবে প্রভাবিত হন। প্রায় সকল বিষয়ই ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা স্বীকৃত যে রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ মানবাধিকারের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা মৌলিক অধিকারের থেকে কোন অংশে হীন নয়। সুপ্রীম কোর্টের মতে মানুষের সাধারণ এবং মৌলিক অধিকারগুলি অলংঘনীয় এবং অসংশোধনীয়।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সরকারের দ্বারা সাধারণ মানুষের মানবাধিকার লংঘনের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে যেমন প্রাণহানি বা দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে তেমন ক্ষয়ক্ষতিও ঘটেছে। এর যোগ্য উদাহরণ গণতান্ত্রিক কাম্পুচিয়ায় পলপট, উগান্ডায় ইদি আমিন এবং লাতিন আমেরিকায় শাসক যে সরকারের অধীনে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণবলি ঘটেছে। সত্যের প্রহসন ঘটবে যদি না আমরা স্বীকার করি যে, রাষ্ট্রসংঘের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং মানবাধিকারের সুরক্ষা, উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য লিখিত সংবিধানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও মানবাধিকার লংঘন এবং অস্বীকারের ঘটনা ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

মূল মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারসহ সমগ্র সংবিধানের অভিভাবক এবং রক্ষকরূপে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। সুপ্রীম কোর্ট মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে এবং ভয়, পক্ষপাত, প্রীতি অথবা বিদ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মূল মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করেছে। সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা নির্ধারিত মানবাধিকার ভঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত মামলাগুলি যদিও এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতা এবং হিংসার নিত্যনতুন ঝোঁকের প্রেক্ষিতে সরকার প্রচলিত আইন-প্রণালী এবং প্রশাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেছেন এই ভেবে যাতে তাদের মধ্যে বৃহত্তর দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা আনা যায় এবং পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত ও কার্যকর উপায় বার করা যায়। এই প্রচেষ্টার ফলেই মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, ১৯৯৩ শীর্ষক আইনটি চালু হয়। মানবাধিকার এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয়ের অধিকতর সুরক্ষার জন্য এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রণয়ন সরকার এবং সংসদের তরফে নিশ্চিতভাবে এক শুভ পদক্ষেপ। কেন্দ্রে একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্যস্তরে অনুরূপ কমিশন গঠনের কথা এই আইনে বর্ণিত।

কমিশনের ক্ষমতা এবং কার্যগুলি এই আইনের ১২ নং ধারায় উল্লিখিত রয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটিও বলা আছে যে কোন সরকারি কর্মচারীর দ্বারা মানবাধিকার লংঘন বা হ্রাসকরণ বা এমন লংঘন প্রতিরোধে অবহেলার বিরুদ্ধে নিপীড়িত ব্যক্তি বা তার তরফে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রেরিত অভিযোগে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কমিশন অনুসন্ধান চালাতে পারে। মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগজনিত কোন মামলা মুলতুবি থাকলে আদালতের অনুমতি নিয়ে মানবাধিকার কমিশন সেই মামলায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। রাজ্য সরকারকে জানিয়ে কমিশন যে কোন কারাগার (বর্তমানে সংশোধনাগার) অথবা রাজ্য সরকারাধীন যে কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ আটক আছেঅথবা চিকিৎসা বা সংশোধন বা সুরক্ষার জন্য পড়ে রয়েছে তা পরিদর্শন করতে পারে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান পর্যবেক্ষণ করে তার উপর সুপারিশ করতে পারে। মানবাধিকার বিষয়ক ক্ষেত্রে কমিশন গবেষণা চালাতে পারে এবং তা উন্নত করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে কাজের জন্য বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ দান করতে পারে। কোন সরকারি কর্মচারীর দ্বারা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার অনুসন্ধান এবং তদন্ত থেকে যদি দেখা যায় উক্ত সরকারি কর্মচারী দোষী, তবে কমিশন সংশ্লিষ্ট লোক বা লোকেদের বিরুদ্ধে যেমন বিচারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মনে করে তেমন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষর নিকট সুপারিশ জানাতে পারে।

মানবাধিকার কমিশন গঠন হল সঠিক পথে সঠিক পদক্ষেপ। এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে কমিশন কাজ করা শুরু করেছে এবং আশা রাখি যে মানুষের মানবাধিকার রক্ষার্থে কমিশন সম্পূর্ণ কার্যকরী ভূমিকা নেবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাস বজায় থাকে। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে কিছু অক্ষমতার জন্য কমিশন প্রাথমিক কিছু সমস্যায় ভুগে চলেছে। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকরী, দক্ষ এবং ফলপ্রদ করে তুলতে আইনে কিছু পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয়। আইনে নিম্নলিখিত পরিবর্তনসাধন খুবই সমাদৃত হবে —

ক) যদি কমিশনের সিদ্ধান্ত মানা বাধ্যতামূলক না করা যায়, তবে তার সুপারিশগুলি যত শীঘ্র সম্ভব কার্যে পরিণত করতে হবে।

খ) রাজ্য কমিশনকে অবমাননার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

গ) যদি দোষী ব্যক্তি পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া কমিশনে শুনানীর জন্য উপস্থিত না হয়, তবে তার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির ক্ষমতা রাজ্য কমিশনকে প্রদান করতে হবে।

ঘ) সকল শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী বা আধিকারিক (কেন্দ্রীয়, রাজ্য অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ) সাপেক্ষে রাজ্যের এলাকাধীন সকল মানবাধিকার ভঙ্গের ঘটনার উপর রাজ্য কমিশনের একচ্ছত্র এক্তিয়ার থাকবে।

ঙ) রাজ্যে কর্মরত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর কর্মচারিবৃন্দের বিরুদ্ধে কৃত অভিযোগ গ্রহণ করার অনুমতি রাজ্য কমিশনকে দিতে হবে।

চ) কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে আবেদন জানানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি, এমন আদেশ বেরোনোর তিরিশ দিনের মধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন জানাতে পারবে।

যাহা হউক, কিছু সমালোচক এমন পরিবর্তনকে অলীক চিন্তাভাবনা বলে মনে করতে পারে। কিন্তু যদি সেই আশা সত্যে না পরিণত হয় তবে কমিশন গঠনের আসল উদ্দেশ্যটাই মাঠে মারা যাবে।

মুক্তিবন্দিদের জন্য স্থায়ী আমানত প্রকল্প

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার পরে অর্থকষ্টে যাতে কেউ পুরাতন অপরাধের পথে ফিরতে বাধ্য না হয় তারজন্য কয়েদিদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা-সম্ভবতঃ এই ধরনের প্রকল্পের চিন্তা এই প্রথম। ইতিপূর্বে রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারের কয়েদিদের ব্যাংকে টাকা জমা রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পে আরো বাড়তি কিছু সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কয়েদিদের টাকা ব্যাংকে স্থায়ী আমানত প্রকল্পে রাখা হবে, সেই টাকা সুদে আসলে এমন ভাবে বাড়বে যাতে বন্দিরা মুক্তির সময় পর্যাপ্ত অর্থ নিয়ে বাড়ী যেতে পারে।

আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এ ব্যাপারে একটি 'পাইলট প্রজেক্ট' হাতে নেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে সাফল্য পেলে রাজ্যের অন্যান্য সংশোধনাগারেও প্রকল্পটি চালু করা হবে। রাজ্যের কারা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী খুব শীঘ্রই এই সংশোধনাগারের বন্দিদের হাতে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বই হস্তান্তর করবেন। এই সংশোধনাগারের প্রায় চারশত বন্দি এই প্রকল্পের ফলে উপকৃত হবে।

আলিপুর সংশোধনাগারের অধ্যক্ষ জানাচ্ছেন, আইনানুযায়ী বন্দিদের অদক্ষ, অর্ধদক্ষ বা দক্ষ এই তিন ভাগে শ্রেণী বিভাগ করা হয়। সরকার তাদের জন্য যথাক্রমে ১৩০০/-, ১৫০০/- ও ১৮০০/- টাকা করে প্রতি মাসে বরাদ্দ রেখেছে। যেহেতু অধিকাংশ কয়েদিই দরিদ্র পরিবার থেকে আসে, তারা এই টাকা তাদের পরিবারে পাঠিয়ে দেয়।

(পরবর্তী অংশ চতুর্থ পাতার ৩য় কলমে)